Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-III, published on July 2023, Page No. 253 – 261
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

প্রতিবাদ প্রতিরোধ আন্দোলন প্রসঙ্গে মানিক : এক টুকরো ঐতিহাসিক অবলোকন

ড. লিলি সরকার
সহ অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
আনন্দ চন্দ্র শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়
ইমেইল : lilisarkar3@gmail.com
ও
শ্যামল রায়
গবেষক, আনন্দ চন্দ্র শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়

Keyword

Abstract

Discussion

এক অনন্য সাধারণ সৃষ্টি ক্ষমতায় অধিকারী ছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। জ্যৈষ্ঠের খররৌদ্রের মতো যুক্তিবাদী ও সংস্কার মুক্ত ছিলেন তিনি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন পিতামাতার অষ্টম সন্তান (চতুর্থ পুত্র)। জন্ম হয়েছিল ১৯০৮ বাংলা ১৩১৫ বঙ্গাব্দ ১৯মে বাংলা ৬ জ্যৈষ্ঠ। জন্ম স্থান সাঁওতাল পরগণার দুমকা শহর। পিতা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন সে সময় দুমকার অ্যাসিস্ট্যান্ট সেট্‌লমেন্ট অফিসার। বড়দাদা সুধাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে কলকাতার মিত্র ইনস্টিটিউশনে শিক্ষারম্ভ ঘটে। চাকরির সুবাদে বড়দাদা অন্যত্র বদলি হয়ে গেলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় টাঙ্গাইলে পিতার কর্মস্থলে চলে আসেন। শহুরে জীবন থেকে মুক্ত মানিক প্রকৃতির কোলে বেড়ে ওঠেন। উদ্দাম দুরন্ত স্বভাব, বাঁধভাঙা কৈশোর হাটে মাঠে বাটে কেটে যেতে থাকে কখনো উদাত্ত গলায় গান গেয়ে কখনো বা বাঁশি বাজিয়ে। জীবন গঠনের জন্য প্রয়োজন মানুষের সঙ্গে নিবিড় বন্ধন গড়ে তোলা। মানুষের প্রতি একান্ত দরদী শিল্পী মানিক কৈশোরে মাঝি - মাল্লা ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ান প্রভৃতি সাধারণ সফলের সঙ্গে মিলে মিশে জড়িয়ে ছিলেন। তাঁর মনোজগতের প্রচ্ছদপট এদের উপস্থিতিতে গড়ে উঠেছিল। মাতা নীরদাসুন্দরী দেবী প্রয়াণে মানিকের জীবনের ছন্দপতন ঘটে। ছন্নছাড়া হয়ে যায় বিদ্যালয় জীবন। ঘনঘন বদল হতে থাকে বাসস্থান ও বিদ্যালয়। কখনো সেজদাদা, কখনো বড়দিদির শ্বশুরবাড়ি। কৈশোরের এই অস্থায়ীত্বের বিড়ম্বনা মনের মধ্যে এনে দিল বিষণ্ণতা ও নিরাপত্তা হীনতা।

স্বাভাবিক পারিবারিক বন্ধনের প্রয়োজনীয় বেষ্টন মানুষের মানসিক স্থিতির জন্য অনিবার্য তার অবকাশ মানিকের জীবনে গড়ে ওঠে নি। অংকের ছাত্র বিজ্ঞানের সাধক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শুভ পদ সঞ্চার হলো সাহিত্যের আঙ্গিনায়। সাহিত্য তাঁর হাতে অলীক কল্পনাবিলাস থেকে মুক্ত হয়ে এক ভিন্ন মাত্রার দ্যোতনা নিয়ে প্রকাশিত হলো।

ম্যাট্রিকুলেশন উত্তীর্ণ হয়েছিলেন গণিতে লেটার মার্কস সহ প্রথম বিভাগে। ভর্তি হয়েছিলেন বাঁকুড়ার ওয়েসলিয়ান মিশন কলেজে আই. এস. সি. পড়বার জন্য। সময় ১৯২৮। আই. এস. সি. উত্তীর্ণ হন প্রথম বিভাগে। এই সময় কলেজ হস্টেল পালিয়ে মদ ও সিগারেটের আসক্তি তৈরি হয়। বিপ্লবি অনুশীলন দলের সঙ্গে এই সময় যোগাযোগ হয়।

এই প্রথম প্রতিবাদ প্রতিরোধ আন্দোলনের সঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরাসরি সাক্ষাৎ ঘটে। ব্রিটিশ ভারতবর্ষ মাতৃ ভূমির শৃঙ্খল মোচন করতে প্রতিভাবান ছেলেদের যে আত্মদানের মিছিল সেদিন প্রকাশ্য ও নেপথ্য দু ভাবেই গড়ে উঠেছিল তার থেকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে পারেন নি। এরপর অঙ্ক শাস্ত্রে সাম্মানিক নিয়ে বি. এস. সি. পড়তে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে আগমন। ১৯২৮ সাল।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মানসপটে বিপ্লবের জন্ম হয়েছিল প্রচ্ছন্নভাবে বহু পূর্বেই। ১৯০৫-১৯১৭ এই সময়কালে সেকালের যুব সমাজকে সুস্থির হয়ে থাকতে অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল একথা বলাবাহুল্য। 'অতসী মামী' গল্পে আপাত রোমান্টিক বুনন মানিক সৃষ্টি পরিক্রমায় ব্যতিক্রমী। মানিকের সাহিত্যের সিংহভাগ জুড়েই প্রতীয়মান প্রতিবাদের বয়ান। লেখকদের সামাজিক নিরপেক্ষতার প্রশ্নটিকে গণআন্দোলনের পুরোধা পুরুষগণ নস্যাৎ করেছিলেন। লেখনীর বিষয় নির্বাচনে তাদের সমাজ রাজনৈতিক টানাপোড়েন বিপ্লব আন্দোলন প্রভৃতিকে গ্রহণ করতে হয়। বাস্তব সম্পর্কে উদাসীন হয়ে লিখলে সে লেখা সমাজের সঠিক প্রতিচ্ছবি তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়। শিল্প সাহিত্যকে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ থেকেই চালিত হতে হয়। শিল্প সম্পর্কে লেনিনের ধারণার স্পষ্টতা ধরা পড়েছিল ক্লারা জেটকিনের কাছে লেখা একটি চিঠিতে।

> "শিল্প জনগণের। এর মূল শ্রমজীবীদের জীবনের গভীরে উপ্ত হওয়া উচিত। শিল্প শ্রমজীবীদের বোধগম্য এবং প্রিয় হয়ে উঠবে। তাদের মুক্ত করবে, তাদের অনুভূতি, ভাবনা ও ইচ্ছাকে একত্র ও উন্নত করবে। তাদের কর্ম স্পৃহাকে উৎসাহিত করবে এবং ভিতরকার শিল্প সৃষ্টির প্রবণতাকে বিবৃদ্ধি দেবে।"[১]

সাহিত্যকর্মের প্রতি লেনিনের প্রদত্ত 'নিরপেক্ষ লেখকরা নিপাত যাক' এই ধরনের ব্যারিকেড সেদিনের আন্দোলন পন্থী সাহিত্যিকগণের মনে ভীতি সঞ্চার করেছিল। কারণ কমিউনিস্ট আন্দোলনের হোতা পুরুষ কার্ল মার্কস শিল্প সাহিত্যকে যে কোনরকম বিধিনিষেধের বেড়াজাল থেকে মুক্ত রাখার পক্ষপাতী ছিলেন।

বিপ্লবের আদর্শকে বাস্তবায়িত ও ফলপ্রসূ করার জন্য লেনিনের নিষেধাজ্ঞার প্রয়োজন ছিল। পার্টির ভেতরের লেখকগণ সাহিত্যের সৌখিন মুজদুরিতে মগ্ন হয়ে পড়লে শ্রমিক শ্রেণির আদর্শ ও কর্মপদ্ধতি জনগণের সামনে তুলে ধরা কঠিন হয়ে পড়বে। তাই লেনিনের নিষেধাজ্ঞা যেন বুর্জোয়ার গণিকাবৃত্তি ও নর-নারীর সস্তা রোমান্টিক চিত্র রচনাকারী লেখকগণের প্রতি একজাতীয় সাবধান বাণীও বটে। শ্রমিক আদর্শ প্রতিবাদী প্রতিবিদ্বান শিল্প সাহিত্যের গুণমান বিস্মিত করে এই অভিযোগের জগতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একাধিক গল্প-উপন্যাসকে উদাহরণ হিসাবে তুলে ধরা যেতে পারে।

একালের এক প্রথিতযশা সাহিত্যিকের লেখায় কমিউনিস্ট সাহিত্যের মূল মর্মবাণী প্রকাশিত। বুর্জোয়া রোমান্টিক বিলাসিতা ও নরনারীর সম্পর্কের আদি অকৃত্রিম কাহিনীর চর্চিত চর্বণ বাংলা সাহিত্যের আভিজাত্য বৃদ্ধি করেনি। অনেক লেখায় ভোগবিলাস নির্ভর সমাজ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা কাহিনীর দলিল সাহিত্য হিসাবে গুণমানে ও স্থায়িত্বের নিরিখে অস্তিত্ববান।

রোমান্টিক সাহিত্যের প্যানপেনে প্রতিরূপ সময়ের সংকট বৃহত্তর সমাজ প্রেক্ষিতকে প্রতিফলিত করতে ব্যর্থ। এক চূড়ান্ত ভোগবাদী মনন ও আত্মসর্বস্ব আকাঙ্ক্ষার জালে বেষ্টিত থেকে সাহিত্য সময় উত্তীর্ণ হয়ে কালের যথাযথ দলিল হয়ে উঠতে সক্ষম হয় নি। মহাশ্বেতা দেবীর নিজস্ব বয়ানে –

> "সত্তরের দশকের সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের মানসিক নির্বীর্যতা ও অন্ধকার অবক্ষয়ের চূড়ান্ত চেহারা দেখলাম। দেশ ও মানুষ যেখানে প্রত্যহ রক্তাত অভিজ্ঞতায় দীর্ণবিদীর্ণ হচ্ছিল, সেখানে সাহিত্য এত বড় যন্ত্রণার শিক্ষাকে অস্বীকার করে পরির দেশের অলীক, স্বপ্নাশ্রয়ী বাগানে মিথ্যে ফুল ফোটাবার ব্যর্থ, আত্মঘাতী খেলায় ব্যস্ত রয়ে গেল। কেন এমন হল, তার বিশ্লেষণ করল না কেউ। সামগ্রিকভাবে খুব কম লেখাই সময়ের দলিল হয়ে রইল।"[২]

লেনিনের নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ ঘনিয়ে উঠেছিল নানা দিক থেকে। আর্নস্ত ফিশার তাঁর রচিত প্রবন্ধ 'শিল্প এবং বিমূর্ত আধিসৌধ' -এ শিল্প সাহিত্যকে বিপ্লব ও প্রচারবাদ দ্বারা আক্রান্ত হবার বিরোধিতা করেছেন। পার্টিগত কৌশল ও কর্মপদ্ধতি এবং শ্রমিক শ্রেণির আদর্শের প্রতিফলন শিল্প সাহিত্যে ঘটাল সেই শিল্প সাহিত্য থেকে জীবন বাদ পড়ে যায়। শিল্পীর ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করেও রাজনীতির জগতের মানুষ হয়ে ওঠা সম্ভব হয় গোর্কি ছিলেন তার জ্বলন্ত উদাহরণ। শিল্পী সত্তা এবং রাজনৈতিক সত্তা দুটি সত্তার অদ্ভুত সমন্বয় ছিল গোর্কির মধ্যে। গোর্কি সম্পর্কে লেনিন বলেছিলেন শিল্পের জগৎ ত্যাগ করে গোর্কিকে রাজনীতির জগতের মানুষ হয়ে উঠতে হয় নি। মার্কসবাদী লেনিনবাদী দৃষ্টিতে শিল্পীর স্বাধীনতার অর্থ হচ্ছে জনগণের স্বার্থে, জনগণের বৌদ্ধিক জীবনের সমৃদ্ধির জন্যে জনগণের সঙ্গে অগ্রসর হওয়া।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পগুলির প্রতি পরতে এ হেন বিস্তার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। তাঁর অন্যতম ছোটগল্প 'হারানের নাতজামাই' প্রতিবাদ ও প্রত্যয়ের গল্প। পটভূমিতে তেভাগা আন্দোলন। শিল্পীর ভাষিক ও আবেগের সংযম তাঁর অলংকার। গল্পের অবয়বে তে-ভাগা আন্দোলন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত উচ্চারণ করেছেন –

> "শীতের তেভাগা চাঁদের আলোয় চোখ জ্বলে ওঠে চাষিদের।"[৩]

হারানের ঘর ঘেরাও করেছে পুলিশ। তে-ভাগা আন্দোলনের নেতা ভুবন মণ্ডল আশ্রয় নিয়েছে হারানের ঘরে। বিপদ সংকেত হিসাবে শাঁখ আর উলুধ্বনি দেবার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ সারা গ্রাম ঘিরে ফেলার চেষ্টা করলেও ভুবন মণ্ডল হারানের ঘর থেকে পালাবার সময় পেত। কিন্তু সেদিন সে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে পুলিশ সরাসরি গিয়ে ঘেরাও করে হারানের বাড়ি।

ব্রিটিশ সরকারের দাদন প্রথার বলি হয়েছিলেন বাংলার হাজার হাজার কৃষক। ঋণের দায়ে সর্বস্ব হারিয়ে তারা পথ বসতেন। সাধারণ কৃষকদের অবস্থা ছিল দারিদ্র্য সীমার সর্ব নিম্নে। জাতীয় আন্দোলনে কৃষকদের যোগ দেবার পরম্পরা ভারতের ইতিহাসে ব্রিটিশ যুগ থেকেই বর্তমান। ভারতের জাতীয় আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়েছিলেন ভারতবর্ষের কৃষক সমাজ। ভারতবর্ষের জাতীয় নেতৃত্বে ঔপনিবেশিক শাসকদের ওপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য কৃষক সম্প্রদায়কে জাতীয় আন্দোলনে সামিল হতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। কৃষক সমাজকে জাতীয় আন্দোলনে সামিল করার জন্য জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বে দুটি সূত্রে তাদের একত্রীকরণ করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। প্রথমটি ছিল কৃষক সমাজ যেন একটি দৃঢ় সংঘবদ্ধ সামাজিক গোষ্ঠী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। দ্বিতীয়টি হল কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে বর্গ, সম্প্রদায় বা আঞ্চলিক বিভেদ কাটিয়ে তোলা। কৃষকদের মধ্যে অখণ্ড শ্রেণিচেতনা বোধ গড়ে উঠতে যদিও অনেকটা সময় লেগেছিল। কৃষকের শ্রেণিচেতনার ঐক্যবদ্ধ রূপ গড়ে উঠবার আগেই জমিদার শ্রেণির রাজনৈতিক মেরু করণ ঘটে গিয়েছিল। জমিদার ও জোতদাররা ক্রমশ রাজনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। কংগ্রেসের নেতৃত্বের এক শক্তিশালী অংশ কৃষক সংগঠনকে ভালো চোখে দেখে নি। যদি ১৯৩৮ সালে কংগ্রেসের হরিপুরা অধিবেশনে কিষাণদের কৃষক ইউনিয়ন সংগঠিত করার অধিকারকে স্বীকার করে নিয়েছে। ঔপনিবেশিক কৃষি কাঠামোয় কৃষকদের পৃথক শ্রেণি সংগঠন ও জাতীয় আন্দোলনকে গান্ধীজী পর্যন্ত নৈতিক সমর্থন জানান নি।

গান্ধী ১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে যুক্ত প্রদেশের আন্দোলনকারী কৃষকদের পরামর্শ দিয়েছিলেন-

> "জমিদাররা যদি আপনাদের ওপর নিপীড়ন করে আপনাদের তা একটু সহ্য করতে হবে, আমরা জমিদারদের সঙ্গে লড়াই করতে চায় না। - জমিদাররাও গোলাম আমরা তাদের অসুবিধার মধ্যে ফেলতে চায় না।"[৪]

গান্ধীজীর এই জাতীয় মতামত ও কৃষকদের প্রতি এরূপ নির্দেশ সমর্থন করা যায় না। ব্রিটিশ শাসনকালে জমিদারগণ সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য ও আবাস ভোগ করতেন। পরাধীন দেশের ঔপনিবেশিক শাসনে জর্জরিত দেশবাসী স্বাধীন দেশে গণতন্ত্রের কামনার জন্য লড়াই করতে এগিয়ে এল। যে ইংরেজ ইউরোপে ফ্যাসিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করছে তারাই ভারতে শাসনের নামে ফ্যাসিবাদী বীভৎসতার নগ্নরূপ প্রকাশ করেছে। বিশের দশকের গোড়া থেকে এদেশে কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠিত হচ্ছিল। একদল তরুণ মার্কসবাদী চিন্তাভাবনায় ভাবিত হচ্ছিলেন। তাঁরা মার্কস এঙ্গেলসের বই পড়েছিলেন। সোভিয়েত রাশিয়ায় লেনিনের অভ্যুত্থান সম্পর্কে খবর নিচ্ছিলেন। এরাই দেশে সাম্যবাদী ভাবনার প্রচার করতে শুরু করেন। শিল্প সাহিত্যের ভাবনাতেও সেই দর্শনকে প্রয়োগ করার কথা ভাবেন।

বিভূতিভূষণের মতো নির্জনতা প্রিয় লেখকও সমাজ চেতনার মুখর হয়ে ওঠা সাহিত্যকে সাধুবাদ জানাচ্ছেন। বিভূতিভূষণ লিখছেন –

> "I am most happy when I am in a lonely primeval forest."[৫]

[আমার লেখা, ১৯৬১]

তিনিই নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের মীরাট অধিবেশনে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন –

> "বর্তমানে বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে বড় সুসংবাদ, এ সাহিত্য ক্রমশ সমাজ চেতনায় মুখ হয়ে উঠেছে। -- কল্পনার রস বিলাশ নিয়ে সাহিত্য রচনা করলে তা আজ নিতান্ত অসার বলে পরিগণিত হবে জাতির উগ্র বেদনা-বোধের সম্মুখে। জাতিকে সাহায্য করবে না। পথ দেখিয়ে দিতে পারবে না। দেশকে জাগাতে হবে।"[৬]

বাংলা রঙ্গমঞ্চেও এই সচেতনতার ঢেউ এসে পড়ে। সমাজের সঙ্গে সংযোগপূর্ণ থাকার উদ্দেশ্য নিয়ে গণনাট্য আন্দোলন গড়ে ওঠে। ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪২ সালে। ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক শিল্পী সঙ্ঘের সদস্য ছিলেন জয়নুল আবেদিন ও চিত্ত প্রসাদ ভট্টাচার্য। মন্বন্তরের সার্থক ছবি তুলে ধরেছিলেন এই দুই শিল্পী তাঁদের আঁকা ছবিতে। ১৯৪২ সালের ৮ ই মার্চ ঢাকায় ফ্যাসিস্ট বিরোধী এক মিছিলে অংশগ্রহণকালে সোমেন চন্দ্র নামে এক সাংগঠনিক কর্মী বিরোধী পক্ষের আক্রমনে নিহত হন। সে এক উত্তাল সময়। বাংলার বাইরে লখনউ – এ প্রগতি লেখক শিল্পী সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৩৬ –এ। সম্মেলনের উদ্বোধন ছিলেন মুন্সী প্রেমচাঁদ।

১৯৩৫ সালের নভেম্বর মাসে লন্ডনের ডেনমার্ক স্ট্রিটের নামকিং চাইনিজ রেস্তোরাঁয় ভারত ও ব্রিটেনের লেখক শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীরা এক সমাবেশে মিলিত হন। এদের মধ্যে ভারতীয়দের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন মুলকরাজ আনন্দ, রজনীপাম দত্ত, রাজা রাও, ইকবাল সিং, মুহম্মদ আশরফ, ভবানী ভট্টাচার্য প্রমুখ। উপস্থিত ব্রিটিশ সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হ্যারল্ড ল্যাস্কি, হারবাট রীড, সন্টেগু স্লাটার, ই. এম. ফস্টার প্রমুখ।

১৯৪৫ -এ নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ'। যার যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাস রুশ বিপ্লবের সাফল্য। সোভিয়েত রাশিয়ার আত্মপ্রকাশ। ১৯৩০ জাতীয় যুক্তফ্রন্ট গঠন। ১৯২৮-২৯ পুঁজিবাদের ভয়াবহ সংকট ঘনীভূত হয়েছিল পৃথিবী ব্যাপী। যার অনিবার্য দল ছিল ফ্যাসিজমের বাড়বাড়ন্ত।

সপ্তম কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের অধিবেশন বসে ১৯৩৫ -এ। বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে 'United Front' তৈরির বাস্তব অবস্থা অঙ্কুরিত হচ্ছিল। ডিমিট্রিক প্রকাশ করলেন তাঁর বিখ্যাত ইউনাইটেড ফ্রন্ট – এর থিসিস। ১৯৩৬ – এর ১৮ জুলাই ফ্রাঙ্কোর নেতৃত্বে এবং হিটলারের মদতে স্পেনে ফ্যাসিস্ট অভ্যুত্থান ঘটে।

এদেশে জাতীয় কংরেস ফ্যাসিবাদ বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ১৯৩৬ –এ লখনউ কংরেস অধিবেশনে জওহরলাল নেহেরু এই সংক্রান্ত যে ভাষণ প্রদান করেছিলেন তা ঐতিহাসিকভাবে স্মরণীয়। শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে ভদ্র সমাজের যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

১৯২৯ – এর মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার পূর্বেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয়ে গিয়েছিল। ১৯২০-৩০ বাংলার শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের অনুপ্রেরণা দিয়েছিল যুগান্তর অনুশীলন প্রভৃতি বিপ্লববাদী সংগঠনগুলি। আই. এ. পড়াকালীন হস্টেল জীবনে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের প্রারম্ভে পার্টি সংগঠন তখনও দৃঢ় হয় নি। রাজনীতিগতভাবে একদিকে ছিল ব্রিটিশ বিরোধীতা অন্যদিকে ছিল কংগ্রেসের আঘাত। সাড়া পৃথিবীতে কমিউনিস্ট আন্দোলন যেন আতঙ্ক তৈরি করেছিল। ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার সঙ্গে সদ্য প্রতিষ্ঠিত কমিউনিস্ট মতাদর্শকে আত্ম প্রতিষ্ঠা অর্জনের জন্য বিস্তর সংগ্রাম করতে হয়েছিল। পৃথিবীর রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টি সবসময় নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে সমর্থ হচ্ছিল না। পার্টির ভীত কাঁচা হবার জন্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রও ছিল দুর্বল। পার্টি তখন কাউকে সদস্য পদ দেয় নি। বাছাই করে সদস্য পদ প্রদানের জন্য কোন ব্যবস্থা তখন পার্টির অভ্যন্তরে ছিল না। যে যখন পেরেছে পার্টির সদস্য পদ গ্রহণ করেছে। ১৯৬০-৬২ সালে চীন ভারত সংঘর্ষ বাধে। কমিউনিস্টদের উপর জাতীয় কংগ্রেসের দমন পীড়ন শুরু হয়। কমিউনিস্টরা চীনপন্থি অতএব তারা দেশদ্রোহী এ হেন আক্রমণ পার্টির সূচনালগ্নে সংগঠনকে দৃঢ় করার পথে অন্তরায় তৈরি করে।

পার্টির অন্দর মহলে মতাদর্শগত বিভেদ দেখা দেয়। ১৯৬৪ তে পার্টি দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। সি. পি. আই এবং সি. পি. আই (মার্কসিস্ট)। ১৯৬২ –র চীন ভারত সংঘর্ষের অনিবার্য ফল হিসাবে গণনাট্য সঙ্ঘের সর্ব ভারতীয় কমিটিগুলি বিলুপ্ত হয়ে গেলে গণনাট্য সঙ্ঘ অস্তিত্বের সংকটে পড়ে। নেতৃত্বের অভাব, যোগাযোগ হীনতা, পার্টি কর্মীদের মধ্যে সম্পর্কহীনতা, আন্দোলন হীনতা এবং কর্মসূচী বিহীন ভাবাদর্শের শূন্য আস্ফালনে গণনাট্য সঙ্ঘ সাংগঠনিক দিক থেকে প্রায় ব্যর্থ হয়ে পড়ে। এ হেন সাংগঠনিক দুঃসময়ে শিল্প সাহিত্য মতাদর্শগত দিক থেকে দ্বান্দ্বিক বাস্তবতায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে। শিল্প নির্মাণে সংকট দেখা দেয়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় হারানের নাতজামাই সেই সংকটকালে বাংলা থিয়েটারে অভিনয়ের জন্য মনোনীত হয়। মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক গণ সংগঠন ছিল গণনাট্য সঙ্ঘ। পশ্চিমবঙ্গে এই গণনাট্য সঙ্ঘ নতুন করে গড়ে ওঠে ষাটের দশকে। কমিউনিস্ট পার্টির অন্যান্য শাখা সংগঠনগুলিও নিজস্ব সাংস্কৃতিক সংগঠন ছিল। ১৯৬৭ তে গণনাট্য সঙ্ঘ পুনর্গঠিত হওয়ার পর নতুন উদ্যমে কাজে নেমে পড়ে। গণনাট্য সঙ্ঘ ছাড়াও সক্রিয় কাজকর্ম দ্বারা অনেক বেশি অসাম্য ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিল ক্রান্তি শিল্পী সঙ্ঘ।

রেভলিউশনারি সোসালিস্ট পার্টি (আর. এস. পি.) ক্রান্তি শিল্পী সঙ্ঘ তাদের কাজ শুরু করেছিল বহরমপুরকে কেন্দ্র করে। গণনাট্য সঙ্ঘের মত এখানেও প্রতিভাবান শিল্পীর সমাবেশ ঘটেছিল। তুলশী লাহিড়ী, কালী সরকার, রসরাজ চক্রবর্তী, সবিতাব্রত দত্ত প্রমুখ ছিলেন ক্রান্তি শিল্পী সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত। ক্রান্তি পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৯৪৭-৪৮ সালে ত্রিদিপ চৌধুরী ও ড. নীহাররঞ্জন রায়ের সম্পাদনায়। তাদের ঘোষিত লক্ষ্য ছিল – অসাম্য ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে সংগ্রামী প্রতিরোধ।

১৯৪৪ – এর ১৫ - ১৭ জানুয়ারি তারিখে অনুষ্ঠিত ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতি মণ্ডলীর অন্যতম সদস্য ছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। ক্রমে এদেশের প্রগতি লেখক আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং ঐ বছরেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। কমিউনিস্ট পার্টি এবং পার্টির সাহিত্য ফ্রন্টের সঙ্গে তিনি আমৃত্যু যুক্ত ছিলেন। ২৫-২৭ আগস্টে অনুষ্ঠিত পূর্ববঙ্গ প্রগতি লেখক ও শিল্পী সম্মেলনে সাধারণ

অধিবেশনের অন্যতম সভাপতি ছিলেন। ১৯৪৫ – এর ১-৮ মার্চ অনুষ্ঠিত ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতি মণ্ডলীর অন্যতম সদস্য ছিলেন। বর্তমান সম্মেলনে পুনরায় সর্ব ভারতীয় সংস্থার সঙ্গে সংগতি রেখে সঙ্ঘের বাংলা শাখার নাম হয় প্রগতি লেখক সঙ্ঘ এবং এই সম্মেলন থেকে লেখক উক্ত সঙ্ঘের পরবর্তী বছরের অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১২ মে তারিখে কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে গল্প লেখার গল্প শীর্ষক পর্যায়ে ভাষণ দেন। ১৯৪৯ –এর এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত প্রগতি লেখক সঙ্ঘের চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলনের সভাপতি হন তিনি। তৎকালীন প্রতিবাদ প্রতিরোধ আন্দোলনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন।

সাহিত্য শিল্পের আলোচনায় মার্কসবাদী ভাবাদর্শের প্রয়োগকে বলা হয় সমাজ তান্ত্রিক বস্তুবাদ (Socialist Realism)। প্রখ্যাত শিল্প সমালোচক আর্নস্ট ফিসার (Ernst Fischer) যুদ্ধ উত্তীর্ণ পাশ্চাত্য জগতে মার্কসবাদের প্রবক্তা হিসাবে পরিগণিত হয়েছেন। তিনি যে গ্রন্থে মার্কসবাদী সমালোচনার প্রবর্তন করেছেন সেটি হল – 'The necessity of Art : A Marxist.' 1980 (Marxist) এই গ্রন্থে ফিশার সমাজ তান্ত্রিক বস্তুবাদী ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

শিল্পী সাহিত্যের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র মনোরঞ্জন নয়, প্রমোদ শিল্পী নয়। সাহিত্য মানুষের দুঃখকষ্ট মানবিক মননের প্রতিচ্ছবি নির্মাণ করে। সাহিত্য মেহনতী মানুষের ক্ষমতার প্রতি আস্থাশীল। ফিশারের নিজের কথায় –

> "The socialism artist and writer adopts the historical viewpoint of the working class. But this dose not mean that he is in duty bound to approve every decision or action taken by whatever party or character represents the working class in his work."[৭]

শব্দ চয়ন ভাষা প্রয়োগ উপমা অলংকার বিচার দ্বারা কবি ব্যক্তিত্বের পরিচয় লাভের এক নবপন্থা পাশ্চাত্য সমালোচনায় বেশ কিছুকাল আগেই প্রচলিত হয়েছিল। রিচার্ডস-এর 'Principles of Literary criticism' –এ ভাষাবিজ্ঞান ও মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করা হয়েছে।[৮]

ঊনিশ শ চল্লিশের দশকে আমাদের দেশে যে গণনাট্য আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল ইস্তেহারে তার উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে লেখা আছে।

> "It is a movement which seeks to make our arts the expression and organism of our people's struggle for freedom economic Justice and a democratic culture."[৯]

এবং তখনই এটা পরিষ্কার করা হয়েছিল যে, গণনাট্য আন্দোলন গড়ে উঠবে বিভিন্ন গণ আন্দোলনের মাধ্যমে এবং শ্রমিক কৃষক ও অন্যান্য সংগ্রামী শ্রমজীবী ও বুদ্ধিজীবীদের যে গণ তান্ত্রিক ফ্যাসিবাদ বিরোধী লড়াই এক কথায় সাম্যবাদের লড়াই – তার সঙ্গে সংযুক্ত থেকে।

সেদিনের গণ আন্দোলনে সরাসরি বা প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল নাট্যগোষ্ঠী গুলির। প্রথম বাংলা থিয়েটারকে হাতিয়ার করে বুর্জোয়া বিরোধী প্রচার ও প্রসারে জনগণকে সচেতন করার কাজ চালিয়ে ছিলেন থিয়েটারের মাধ্যমে। লেখক শিল্পীগণ সেখানে সচেতন সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে যুক্ত ছিলেন পি. আর. সি. বা পিপলস রিলিফ কমিটির সঙ্গে ১৯৪৩ সালের ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ কবলিত হয়ে বহু মানুষের মৃত্যু ঘটে। পি. আর. সি -র উদ্দেশ্য খরা বন্যা দুর্ভিক্ষ প্রভৃতির কবলে পড়া মানুষের পাশে দাঁড়ানো।

২৪৯ নং বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটে পি. আর. সি দপ্তর খোলা হয়। প্রচণ্ড বন্যার তাণ্ডব থেকে রক্ষা করার জন্য কমিউনিস্ট পার্টির উদ্দেশ্যে পিপলস্ ফ্লাড রিলিফ কমিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। সভাপতি ছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

সারা ভারত বিজ্ঞান সম্মেলনে ১৯৪৪ এর মার্চ মাসে সংগঠনের বাংলা শাখা নানা ধরনের অনুষ্ঠান করে। সেখানে 'ক্ষুধা ও মন্বন্তর' (Hunger and Epidemic) সংক্রান্ত নৃত্য সকলকে মুগ্ধ করে। দৈনন্দিন জ্বলন্ত সমস্যাগুলি

কিভাবে শিল্প সাহিত্যের প্রাঙ্গনে উপস্থিত হয়ে জন সচেতনা গড়ে তুলতে সাহায্য করছে তা এই জাতীয় অনুষ্ঠানাদি থেকে স্পষ্ট।

বাংলা থিয়েটারের হাত ধরে যে ফ্যাসিস্ট বিরোধীতার সূচনা হয়েছিল তা ক্রমে ক্রমে বাংলা সাহিত্যের সমগ্র শাখায় তার প্রভাব পড়তে শুরু করেছিল। কেবলমাত্র বাংলা দেশ তথা বাংলা সাহিত্যই নয়, ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলন সমগ্র পৃথিবীর মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের মতো ভাববাদী শিল্পীও তাঁর লেখনীর অভিমুখ পরিবর্তন করেছিলেন। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে রঁমা রঁলা সংগঠিত 'Deceleration of Independence of thought' প্রকাশিত হয়েছিল বিশিষ্ট কয়েকজন লেখকের দ্বারা সাক্ষরিত হয়ে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন গোর্কি, বারবুস, রাসেল স্টেফান জ্যুইগ প্রমুখ। রঁমা রঁলা প্রবর্তিত এই চিন্তা ভাবনার স্বাধীনতাকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বীকৃতি দেন। শিল্পের জন্য শিল্প (Art for Art sake) এ হেন মতাবলম্বী রবীন্দ্রনাথ যাঁর লেখনীতে অলীক কল্পনা বিলাস ও রোমান্টিক মননের প্রতিফলন ঘটে যাকে প্রতিনিয়ত তিনি শিল্পকে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ করে গড়ে তুলতে এবং শিল্পীর যে কোন প্রকার ভাবনা ও লেখনীর স্বাধীনতার সপক্ষে মতামত প্রদান করছেন। এমনকি সাড়া পৃথিবীর যুদ্ধ ও ফ্যাসি বিরোধী সংস্থার সর্বভারতীয় কমিটি ১৯৩৭ সালে কলকাতায় গঠিত হলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন।

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট মাঝরাতে ভারত স্বাধীন হল। এ নিয়ে 'ফ্রিডস অ্যাট মিডনাইট' –এ লেখা আছে। এই স্বাধীনতাকে আমজনতা আবেগ এবং আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করলেও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এর বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখাল। ১৯৪৬ –এর সেপ্টেম্বর ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির কৃষক সভা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তেভাগার দাবীতে বাংলার জেলায় জেলায় আন্দোলন সংগঠিত করবে। মূল পরিকল্পনা ও প্রক্রিয়ার সূচনা হয়েছিল বহু পূর্বেই। চারু মজুমদার নিজেও ছিলেন সেই প্রক্রিয়ার একজন অন্যতম সংগঠক। 'লাঙ্গল যার জমি তার', আধি নয়, তে-ভাগা চাই', 'নিজ খোলানে ধান তোল', 'দখল রেখে ভাগ দর' - এগুলিই ছিল সেদিনের তেভাগার কৃষকদের শ্লোগান। তেভাগা আন্দোলনের সূত্রপাত দিনাজপুরের চিরির বন্দরে। ১৯৪৭ –এর ৪ ঠা জানুয়ারি সেখানকার তালপুকুর গ্রামের কৃষকদের ওপর তখনকার সুরাবর্দী সরকারের নির্দেশে পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালিয়ে হত্যা করে দুজন কৃষককে। নিহত দুই কৃষকের নাম হল সমিরুদ্দিন ও শিবরাম মাঝি। সেই থেকে শুরু।

অশান্ত চারু মজুমদারকে পাঠানো হল দিনাজপুর লাগোয়া জলপাইগুড়ি জেলার পচাগড় এলাকায় (বর্তমানে এই জায়গা বাংলাদেশের অন্তর্গত)। পচাগড় অঞ্চলে চারু মজুমদার তেভাগার সাংগঠনিক নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আরো অনেক সংগঠনের সঙ্গে। তেভাগা আন্দোলনে চারু মজুমদারের অসাধারণ ভূমিকা ও সাংগঠনিক দক্ষতার কথা বিবেচনা করে পার্টি তাকে কৃষক সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক করে কলকাতায় পাঠাতে চেয়েছিল। চারু মজুমদার পার্টির এ হেন সিদ্ধান্ত আপত্তি জানিয়ে বলেছিলেন তিনি কলকাতায় বসে কৃষক নেতা হতে চান না। তেভাগা আন্দোলন সম্পর্কে চারু মজুমদারের নিজের ভাষায় –

> "প্রতিটি গ্রামেই তৈরি হয়ে গিয়েছিল একধরনের সামরিক কম্যান্ড, যা আবার থানা কম্যান্ডের অধীন। বর্শা, বল্লম, ভোজালি, তীর-ধনুক অস্ত্র। গ্রামের সীমানায় পাহারার ব্যবস্থা, পুলিশ এলেই খবর চলে যায়। মেয়েরা শঙ্খ বাজিয়ে সবাইকে জানান দেয়। ধান কেটে তোলা হয়, পঞ্চায়েত খামারে। সেখান থেকে ভাগ হবে, তেভাগা। পুলিশ ব্যাপক অত্যাচার শুরু করল গ্রামে ঢুকে ঢুকে– গ্রাম ছেড়ে সব রাতে থাকতে লাগলো জঙ্গলে। চাষিরা বলত, মানুষ এখন জঙ্গলে আর বাঘ শেয়াল গ্রামে থাকছে। মেয়েদের হল গায়েন কমিটি। উখলিতে ধান কাটার গায়েন (দণ্ড) হাতে মেয়েদের প্রতিরক্ষা বাহিনী। খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা সব জায়গায় – হিন্দু-মুসলমান, নিম্নবর্ণ-উচ্চবর্ণ, সব একাকার।"[১০]

স্বাধীনতার অব্যবহিত পূর্বে বাংলাদেশের মাটিতে যে বৃহৎ কৃষক আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল তা তে-ভাগা আন্দোলন নামে খ্যাত। এই আন্দোলনের সুবিস্তৃত প্রভাব পড়েছিল জন সাধারণের মনে অথচ শেষ পর্যন্ত এই আন্দোলন ফলপ্রসূ

হয় নি। লীগ মন্ত্রিসভা এই আন্দোলনের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করে নি। 'তেভাগার লড়াই' নিবন্ধে প্রখ্যাত নেতা মহম্মদ আবদুল্লা রসুল লিখেছেন– "তেভাগা আন্দোলনের সঙ্গে ভুলত্রুটি যাই থাকুক, তার ফলাফল যাই হোক, বাংলাদেশের কৃষক সভার ইতিহাসে এটাই ছিল তখন পর্যন্ত সবচেয়ে ব্যাপক ও শক্তিশালী আন্দোলন।"

কৃষি সমস্যা ও কৃষকের সমস্যার প্রতি দৃষ্টি পড়েছিল চারু মজুমদারের। চারু মজুমদার উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছিলেন – খেটে খাওয়া মানুষ খাটুনির ফল ভোগ করতে পারে না। শোষণ থেকে সামগ্রিকভাবে মুক্তির কথা বলতেন চারু মজুমদার। সমগ্র উত্তরবঙ্গ জুড়ে তখন আধিয়ারদের আন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছে। জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর, রংপুর জেলার গ্রামে গ্রামে চলেছে জমিদারদের জীড়ন শোষণ। দু বেলা অন্নের সংস্থান নেই। মানুষের শোষণ মুক্তির পথ খুঁজতে তখন দিশেহারা চারু মজুমদার। কোন রাজনৈতিক পথে মানুষের শোষণ মুক্তি ঘটবে তার সন্ধানে ব্যাপৃত তখন চারু। জলপাইগুড়ি জেলা কংগ্রেসের মধ্যেকার বামপন্থী ভাবধারার নেতাগণ শচীন সেনগুপ্ত, মাধব দত্ত প্রমুখ আন্দোলনের ভাবধারা গড়ে তুলতে তৎপর হন। ছাত্র-যুব মধ্যবিত্তদের ঐক্যবদ্ধ করে সংগঠিত করতে প্রয়াসী হন। মার্কসীয় পঠন পাঠনে দীক্ষিত হয়ে প্রাদেশিক কমিউনিস্ট নেতাদের নিয়ে জঙ্গী আন্দোলনের পরিকল্পনা তখন শুরু হয়ে গিয়েছে। চারু মজুমদার সেই আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন।

সত্তরের দশকে 'কাজের বদলে খাদ্য প্রকল্প' (Food for Work) বহু পরিচিত হয়ে ওঠে। পরে সেটা 'গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্প' (Rural Employment Programme) –এর অংশ হয়ে যায়। আরো আগে যখন 'পাবলিক ল ৪৮০' (Public Low 480) কে আশ্রয় করে এদেশে আমেরিকা থেকে গম আনছিল তখনই খাদ্য ভিত্তিক কর্ম প্রকল্পের মূল তত্ত্বটীও আলোচনার আওতার ভিতর স্বাভাবিকভাবে এসে যায়। সেই মূল কথাটা খুবই সহজ। কৃষির বাইরে যারা কাজ করে তাদের খাদ্যটা আসে কোথা থেকে? কৃষক যে খাদ্য উৎপাদন করে তার উদ্বৃত্ত অংশ থেকে। সেই উদ্বৃত্ত যত বাড়বে ততই কৃষির বাইরে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা বাড়বে। নানা ভাবে অবশ্য এই উদ্বৃত্তের অপচয় ঘটে। অর্থনীতি ও আর্থিক পরিকল্পনার একটা উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এই অপচয় রোধ করা। তা না হলে আর্থিক উন্নয়নে বাধা আসে। সত্তরের দশকে ক্রমে আমাদের খাদ্যোৎপাদন অনেকটা বাড়ল, কিছু উদ্বৃত্ত খাদ্যও ক্রমে সরকারের গুদামে জমলো। অথচ অন্যদিকে বেকার ও অর্ধবেকারের সংখ্যাও বাড়ছে। এটা অসঙ্গত বাড়তি খাদ্য দিয়ে কর্মসংস্থান প্রকল্প হবে না কেন? এটাই হল কাজের বদলে খাদ্য প্রকল্পের মূল কথা।[১১]

ষাটের দশকের কৃষি সংকট স্বাধীন ভারতের আর্থিক ইতিহাসের এক প্রধান ঘটনা। ঐ দশকে পৌঁছে কৃষির উৎপাদন আর তেমন পড়ছিল না, যেন কোথায় এসে ঠেকে যাচ্ছিল। এ দিকে খাদ্য শস্যের আমদানি বাড়াতে হচ্ছিল। খাদ্যের জন্য বাইরের দেশের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলাম। জিনিসের দাম বেড়ে যাচ্ছিল, সেই সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই দেখা দিয়েছিল সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা। ১৯৬৫-৬৬ এবং ১৯৬৬-৬৭ দু'বছরেই খাদ্যের উৎপাদন হল খুবই নৈরাশ্যজনক। যোজনা কমিশনকে চিন্তা করতে হল কী করে এই ভয়াবহ অবস্থা ভেঙে বেরিয়ে আসা যায়।[১২]

বাংলা সাহিত্যে তেভাগা আন্দোলনের প্রেক্ষিতে লিখিত একাধিক গল্প মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন। গল্পগুলি হল – 'সাড়ে সাত সের চাল', 'শিল্পী', 'রিক্সাওয়ালা', 'যাকে ঘুস দিতে হয়', 'অসহযোগী', 'বিচার', 'ছিনিয়ে খায়নি কেন', 'হারানের নাতজামাই', 'ছোট বকুলপুরের যাত্রি', 'কে বাঁচায়, কে বাঁচে' প্রভৃতি।

তেভাগার আরো উল্লেখযোগ্য গল্পগুলির মধ্যে সত্যেন সেন – 'ধানচোর', আখতারুজ্জামান ইলিয়াস – 'দখল', ননী ভৌমিক – 'সালিমের মা', 'বাদা', 'আগন্তুক', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় – 'বন্দুক', সমরেশ বসু – 'প্রতিরোধ', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় – 'গৃহ', 'ধান খেতের কাহিনী', নবেন্দু ঘোষ– 'ধানখেত', স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য – 'মন্ত্রশক্তি', সুশীল জানা– 'বউ', 'বেটি', মিহির আচার্য – 'দালাল', সৌরী ঘটক – 'কমরেড', 'অরণ্যের স্বপ্ন' ইত্যাদি।

সমরেশ বসুর 'প্রতিরোধ' গল্পের শেষে বিপ্লবের বীজকে অঙ্কুরে বিনাশ করার প্রচেষ্টা আছে। বিপ্লবের সন্তান ভূমিষ্ঠ না হলে আগামী সমাজকে খুব সহজেই কায়েমি স্বার্থান্বেষী শক্তি নিজেদের সপক্ষে স্ব স্বার্থে পরিচালনা করতে সক্ষম হবে।

তথ্যসূত্র :

১. মুখোপাধ্যায়, ড. বিমলকুমার, মার্কসীয় সাহিত্যতত্ত্ব, দে'জ, কলকাতা, পৃ. ৩১
২. দেবী, মহাশ্বেতা, রচনা সমগ্র ১১, দে'জ, পৃ. ৫১৮
৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, রচনা সমগ্র, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, পৃ. ১৬১
৪. চন্দ্র, বিপান, আধুনিক ভারত : ঔপনিবেশিকতাবাদ ও জাতীয়তাবাদ।
৫. চৌধুরী, দর্শন, গণনাট্য আন্দোলন, অনুষ্টুপ, কলকাতা, পৃ. ১১
৬. ঐ, পৃ.১১
৭. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, বাংলা সমালোচনার ইতিহাস, পৃ. ১৮-১৯
৮. ঐ, পৃ-২২১
৯. চৌধুরী, দর্শন, গণনাট্য আন্দোলন, পৃ. ১৪০
১০. পাল, চিত্তরঞ্জন (সম্পাদিত), তেভাগার নারী, র‍্যাডিক্যাল, কলকাতা, পৃ. ২৮
১১. দত্ত, অম্লান, শতাব্দীর প্রেক্ষিতে আর্থিক বিকাশ, অর্থনীতি গ্রন্থমালা, পৃ. ৭৫-৭৬
১২. ঐ, পৃ. ৭১